প্যারাডাইজ অ্যান্ড আদার স্টোরিজ

খুশবন্ত সিং

অনুবাদ

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

মানবাধিকার নেত্রী কাজী ফৌজিয়া

লেখকের বক্তব্য

১৯৬২ সালে ভারতের সকল জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, সে বছরের ৩ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে পাঁচটায় পৃথিবী থেকে জীবনের অবসান ঘটবে। কারণ ওই নির্দিষ্ট মুহূর্তে আটটি গ্রহ একত্রে মিলিত হবে, যাকে তারা নাম দিয়েছিলেন 'অস্তগ্রহ'। প্রার্থনা উচ্চারণের মধ্যে 'হাভান কুণ্ডে' টনে টনে ঘি জ্বালানো হয়েছিল। স্কুল-কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। বাস, ট্রেন ও বিমান ছিল যাত্রীশূন্য। লোকজন যার যার বাড়িতে পরিবারের সকল সদস্যদের সঙ্গে অবস্থান করে উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করেছে প্রলয়ের।

৩ ফেব্রুয়ারি আসে এবং অতিবাহিত হয়। কোনোকিছুই ঘটেনি। সমগ্র পৃথিবী আমাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেছে।

আমি আশা করেছিলাম যে এই অভিজ্ঞতা ভারতীয়দেরকে শেষ পর্যন্ত জ্যোতিষশাস্ত্র এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার অনুরূপ অন্যান্য হাস্যকর পদ্ধতি—হস্তরেখাবিদ্যা, সংখ্যাতত্ত্ব, মণিরত্ন বিষয়ক বিদ্যা এবং আরও কত কী—এসবের প্রতি বিশ্বাস থেকে মুক্ত করবে। আমার আশা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। হস্তরেখাবিদ্যার ওপর বিশ্বাসের যেন পুনর্জাগরণ হয়েছে, একই সাথে গোঁড়ামি ও অসহনশীলতা যেন প্রবল জোয়ারের রূপ নিয়েছে। ব্যক্তিগত উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে মুখোশে পরিণত হয়েছে অতি ধার্মিকতা। ভারত ধীরে ধীরে পরিণত হতে যাচ্ছে একটি প্রতারক ও ভণ্ডদের দেশে।

আমি এই গল্পগুলো লিখতে শুরু করেছিলাম দুবছর আগে, যখন যুক্তিহীনতা ও নিজেদের সাধু মনে করার প্রবণতার সাথে আমার ধৈর্যের পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

খুশবন্ত সিং

সূচিপত্র

প্যারাডাইজ ১১
জীবনের হস্তরেখা ৩৮
জোরা সিং ৭৬
একটি পুত্রসন্তানের জন্যে ১০১
মালবেরি গাছ ১২৫

প্যারাডাইজ

পুনে, ১৯৮২

কেন আমি এখানে এসেছি তা আংশিক আমার 'প্রিয় ডায়েরি'তে লিপিবদ্ধ আছে। এটি চামড়ায় বাঁধানো নীল রঙের একটি নোটবুক, যাতে আমি আমার হাইস্কুলের জীবনের এবং যে দুই বছর কলেজে ছিলাম, সে সময়ের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড ও চিন্তাভাবনা লিপিবদ্ধ করে রাখতাম। এরপর কাজটা আমার কাছে শিশুসুলভ বলে মনে হলো এবং যে কারণেই হোক আমার টিনএজের পর আমি যা করেছি, তা লিপিবদ্ধ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ওই বছরগুলোর অধিকাংশই বলা যায় নিষ্ফলা বছর। আমার বয়স এখন ত্রিশ বছর, এখনো অবিবাহিত এবং আমেরিকান। অন্তত আমার পাসপোর্ট তাই বলে। কিন্তু পুনরায় আমার ডায়েরির কাছে ফিরে আসতে চাওয়ার মতো পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছিল। সেই নিষ্ফলা বছরগুলো আমাকে ভালোভাবে এবং যথার্থই তাড়া করে ফিরছিল। এবং আমি সেখানেই আছি, যেখানে আমার বেড়ে ওঠার বছরগুলোতে থাকা উচিত ছিল— অর্থাৎ আমি ভারতে আছি।

আমি আমার বাবা-মার দ্বিতীয় ও একমাত্র কন্যাসন্তান। আমার বাবা ইহুদি, বাবার চেয়ে বয়সে দশ বছর ছোট আমার মা অ্যাংলিকান চার্চের অনুসারী খ্রিষ্টান। দুজনের কেউই নিজ নিজ বিশ্বাসের ওপর অবিচল ছিলেন না। আমাদের বিশাল অ্যাপার্টমেন্টের প্রবেশদ্বারে একটি 'মেজুজাহ' এবং সিটিং রুমের বাতির আঁধারের ওপর রাখা ছিল একটি 'মেনোরাহ'। বছরে একবার ইওম কিপুর দিবসে আমরা আমাদের বাবার সঙ্গে সিনাগগে যেতাম। আমার মা ইহুদি শাস্ত্র অনুসারে সেদ্ধ মাংস বিক্রেতার কাছ থেকে মাংস কিনতেন। বছরে একবার আমরা ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে মায়ের সঙ্গে গির্জার ভোজ-উৎসবে যেতাম। লিভিং রুমে একটি ক্রিসমাস ট্রি সাজাতাম এবং বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানাতাম টার্কি রোস্ট, ক্রিসমাস পুডিং খেতে ও মদ পান করতে। ধর্মের ব্যাপারে আমাদের এটুকুই করণীয় ছিল।

আমার বাবা পোলিশ বংশোদ্ভূত বিশালদেহী মানুষ ছিলেন। কণ্ঠে জোর দিয়ে আমেরিকান উচ্চারণে ইংরেজি বলতেন তিনি। আমার মা কেতাদুরস্ত পরিবার থেকে এসেছেন। তিনি ছোটখাটো আকৃতির এবং সোনালি-বাদামি চুল, ঘন নীল চোখ ও বিশাল স্তনবিশিষ্ট অতি আকর্ষণীয়া মহিলা ছিলেন। আমার বাবার মতো রগচটা মানুষকে কেন তিনি বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলেন তা আমি কখনো বুঝে উঠতে পারিনি। বাবা ছিলেন ইহুদি মালিকানাধীন বিরাট এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের চিফ সেলস ম্যানেজার। আমার মা ছিলেন একই কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টর্সের একজন সদস্যের পার্সোনাল সেক্রেটারি, যিনি তাকে তার রক্ষিতা করতে চাইতেন। লোকটি তাকে খুব জ্বালাতন করে এবং বাবা তাকে বলে দেন যে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করবেন। বোর্ডের আরেকজন সদস্যের সেক্রেটারি হন তিনি এবং আমার বাবাকে বিয়ে করেন, যিনি দীর্ঘদিন ধরে তাকে প্রেম নিবেদন করে আসছিলেন।

শুরু থেকেই এই জুটির মধ্যে ভালো বনিবনা হচ্ছিল না। আমার বাবা ছিলেন আসলে প্রেমের অভিনয় করার মতো লোক। কার্যোপলক্ষ্যে তিনি প্রায়ই নিউইয়র্ক থেকে দূরে যেতেন এবং শুতে আগ্রহী মহিলাদের শোয়ানোর ব্যাপারটাকে কিছুই মনে করতেন না। যেখানেই তিনি যেতেন, এ ধরনের মহিলা প্রচুর পেতেন। তিনি এত খামখেয়ালি ছিলেন যে, কোটের কলারে এবং পকেটে তার এসব প্রণয়ের প্রমাণ রেখে দিতেন। আমার বয়স যখন চার বছর সে সময়ের মধ্যেই আমার বাবা-মার বিয়ে ভেঙে যাওয়াটাই শুধু বাকি ছিল। তাদের মধ্যে কথা প্রায় হতোই না। বাবার নারীগমন অব্যাহত ছিল, আমার মাও অনেক প্রেমিকের খোঁজ পেলেন। শেষ পর্যন্ত মা তালাকের মামলা রুজু করলেন। মামলার রায়ে তিনি অ্যাপার্টমেন্ট, সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এবং খোরপোশের জন্য মোটারকম ভাতা পেলেন। বাবাকে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে যেতে হলো। মা আমাদের বাড়িতেই তার প্রেমিকদের চিত্তবিনোদন শুরু করলেন। বাবা-মা দুজনেরই বৈশিষ্ট্য পেয়েছি আমি। আমি আমার বাবার মতোই দীর্ঘ, মায়ের সোনালি-বাদামি চুল, গাঢ় নীল চোখ ও বিশালাকৃতির স্তন। স্কুলে সবচেয়ে সুদর্শনা বালিকা হিসেবে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম। ছেলেদের কাছে আমি দারুণ কাঙ্ক্ষিত ছিলাম। স্কুলের বেসবল টিমের ক্যাপ্টেনের কাছে আমি যখন আমার কুমারিত্ব হারাই তখন আমার বয়স ছিল ষোলো বছর। কয়েক মাস পর্যন্ত আমাদের ডেটিং অব্যাহত ছিল। এরপর সে অন্য মেয়েদের বাইরে নিয়ে যেতে শুরু করে। আমিও অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে ডেটিং-এ গিয়ে সুখী ছিলাম।

হাইস্কুল ও কলেজ সেক্রেটারিয়েল কোর্স শেষ করার পর আমি ভালো বেতনে এক পাবলিশিং হাউজের মালিকের সেক্রেটারি হিসেবে চাকরি নিলাম। আমি নিজের জন্য একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিতে পারতাম। কিন্তু কোনো কারণে মায়ের সাথে বাস করছিলাম। আমার ভাই ততদিনে কলেজের পড়া শেষ করে শিকাগোতে একটি চাকরিতে যোগ দিয়েছে। আমার মা আগের মতোই যখন যেভাবে চাইতেন সেভাবে তার ভদ্রলোক বন্ধুদের মনোরঞ্জন করে যাচ্ছিলেন। আমিও আমার মতো চলছিলাম। রাতের জন্য আমার বয়ফ্রেন্ডদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলাম। মা এবং আমি একজন অন্যজনকে বাধা দিইনি। এমন সময়ও গেছে যখন তিনি তার বন্ধুদের অ্যাপার্টমেন্টে তার অংশে আপ্যায়ন করেছেন, আর আমি আমার অংশে বন্ধুদের মনোরঞ্জন করেছি। বিয়ার বা কফি অথবা কোনো খাবার আনতে কখনো কিচেনে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেলে তিনি জানতে চেয়েছেন, 'হাউ আর ইউ ডুয়িং, হানি?' আমি উত্তর দিয়েছি, 'ফাইন।' এরপর আমরা দুজন যার যার বন্ধুর কাছে ফিরে গেছি।

হাইস্কুলে পড়ার সময়েই আমি মদ পান শুরু করেছিলাম। অতঃপর আমি ধূমপানও শুরু করি। প্রায়ই আমি বাতিকগ্রস্ত মাতালের মতো হয়ে যেতাম এবং যেসব ছেলের সঙ্গে শয্যাগত হতাম, তাদের চিনতাম না পর্যন্ত। কখনো কখনো আমরা ছ'জন থাকতাম, মদ পান করতাম, গাঁজা টানতাম। আমাদের কাপড়চোপড় ছেড়ে বিভিন্ন সঙ্গীর সাথে পালাক্রমে যৌনকর্মে লিপ্ত হতাম। এটা হতো সাধারণত শনিবার সন্ধ্যায়, যার ফলে রোববারটায় আমাদের পক্ষে মদ ও গাঁজার প্রভাব ঝেড়ে ফেলা সম্ভব হতো। আমার ভিতরে এক ধরনের শূন্যতার সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কয়েক বছর এ অবস্থা চলে। এরপর বন্ধুদের সঙ্গে আমার আড্ডা দেওয়ার উৎসাহে ভাটা পড়তে শুরু করে। আমার এই বখে যাওয়াকে এবং যে চেয়েছে তার কাছেই আমার দেহকে সহজলভ্য করার ব্যাপারগুলোকে আমি ঘৃণা করতে শুরু করি। প্রায়ই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তাম আমি। কখনো কখনো আত্মহত্যা করার ইচ্ছা হতো আমার।

এরপর একটি ঘটনা শেষ পর্যন্ত আমার মধ্যে চেতনার উদ্রেক করল যে, আমার জীবন-পদ্ধতির পরিবর্তন আনা উচিত, তা না হলে আমি পাগল হয়ে যাব।

এক সন্ধ্যায় আমি যখন অ্যাপার্টমেন্টে আমার অংশে একা বিছানায় শুয়ে পড়ছিলাম। আমার মায়ের কাছে তার এক বয়ফ্রেন্ড এসেছিল। তাদের কণ্ঠ ক্রমেই উচ্চ থেকে উচ্চতর হলো। মাকে চিৎকার করতে শুনছিলাম, 'আমার ঘর থেকে বের হয়ে যাও, তা না হলে আমি পুলিশ ডাকব।' মুহূর্তখানেক পর

একজন মাঝবয়সি রক্তলাল চোখবিশিষ্ট মোটা লোক টলতে টলতে আমার রুমে প্রবেশ করে ট্রাউজার নিচে নামিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। লোকটি আর কিছু করে ওঠার আগেই আমি হাতের বইটা তার মধ্যাঙ্গ লক্ষ করে ছুড়ে দিলাম। চিৎকার করে উঠল সে, 'দূর হয়ে যা বেজন্মা মাগি। তা না হলে আমি খালি হাতে গলা টিপে মারব তোকে।' বইটি লেগেছিল তার অণ্ডকোষে। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে চিৎকার করতে লাগল, 'বেশ্যা মাগিরা। তোদের দুটোকেই আচ্ছামতো শিক্ষা দেব আমি।' আমি আমার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুমাতে পারলাম না। আমি জানতাম যে, আমার এ ধরনের জীবনযাত্রার পরিবর্তন আনতে না পারলে আমি শেষ হয়ে যাব।

প্রায় এ সময়েই আমি ভারত আবিষ্কার করি। ঠিক কীভাবে ঘটনাটি ঘটে তা পুরোপুরি স্মরণ করতে না পারলেও এটুকু মনে আছে, আমার এক বান্ধবী আমাকে বলেছিল যে, সে রামকৃষ্ণ মিশনে কোনো স্বামীর কয়েকটি বক্তৃতায় হাজির হয়েছিল। ম্যানহাটানে আমি যেখানে বাস করতাম, সেখান থেকে কয়েক ব্লক পরই ছিল রামকৃষ্ণ মিশনটি। যে-লোকটি বক্তৃতা করেছিল তার ব্যাপারে সে অতি উচ্ছ্বসিত। আমি ওকে বলি যে, সে আবার যখন যাবে তখন যাতে আমাকে সেখানে নিয়ে যায়।

বড়ো একটি রুমে প্রায় একশো চেয়ার সাজানো। উপস্থিত শ্রোতাদের প্রায় অর্ধেক ভারতীয়, বাকিরা আমেরিকানসহ বিভিন্ন দেশের ককেশীয় বংশোদ্ভূত লোক। আমি যেসব ধর্মীয় সমাবেশে আগে যোগ দিয়েছি, এটা সেরকম ছিল না। মঞ্চটিতে কার্পেটের ওপর একটি সাদা সুতি চাদর বিছানো। একটি ধূপদানি থেকে সুবাসিত ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরের দিকে উঠছে। সাদা শার্ট ও পাজামা পরা এক তরুণ রুমে প্রবেশ করল। তার চুল সুন্দর করে ছাঁটা এবং দেখতে পরিচ্ছন্ন লাগছে, যেন, সদ্য স্নান সেরে এসেছে। দুই হাত একত্রে যুক্ত করে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে তিনি উচ্চারণ করলেন, 'নমস্তে।' শ্রোতাদের কেউ কেউ 'নমস্তে' বলেই সাড়া দিলো।

লোকটি বিছানো চাদরের ওপর পদ্মাসনে বসে চোখ বন্ধ করলেন। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকার পর হাত দুটি উঁচু করে গভীর, সুরেলা কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'ওম'। শ্রোতাদের অনেকে তাঁর সাথে কণ্ঠ মেলাল। তারা যে সংক্ষিপ্ত দুঅক্ষর-বিশিষ্ট শব্দটিকে উচ্চারণ করল তা নয়, বরং দীর্ঘ লয়ে 'ও...ও-ম-ম' ধ্বনি তুলল যা পুরো কক্ষ জুড়ে প্রতিধ্বনিত হলো। আমি জানতাম না যে, এর অর্থ কী, কিন্তু এর মাঝে আমি সান্ত্বনা খুঁজে পেলাম।

'বন্ধুগণ,' তিনি শুরু করলেন, 'এই বক্তৃতামালার মধ্যে আপনারা আমাকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বলতে শুনেছেন। হিন্দুরা জীবনকে কীভাবে দেখে আজ সন্ধ্যায় আমি সে সম্পর্কে বলব। পাশ্চাত্যের লোকেরা জীবনকে অত্যন্ত ভিন্নভাবে দেখে। এখানে আপনাদের গড়ে তোলা হয় জাগতিক সাফল্য অর্জনের জন্য, যাকে বেঁচে থাকার চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে দেখা হয়। আপনারা দারুণ প্রতিযোগী হয়ে ওঠেন, যাতে জীবনের শেষ পর্যন্ত আরাম-আয়েশের সৃষ্টি হয়ে কাটাতে পারেন। আপনাদের জীবন পূর্ণ হয় উদ্বেগ-উত্তেজনায় এবং এ পরিস্থিতি সামলানোর জন্য আপনাদের অনেককে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে হয় পরামর্শ নিতে। মদ্যপান, মাদক সেবন এবং বাছবিচারহীন যৌনসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আপনারা উচ্চতর পর্যায়ের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করেন। আপনাদের মনে হয় যে, আড়ম্বরপূর্ণ জীবন কাটানো ও মজা করাই সবকিছু এবং সকল অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি। কিন্তু শিগগিরই আপনারা নিজেদের ভিতরের অন্তঃসারশূন্যতা অনুভব করতে শুরু করেন এবং নিজেকেই প্রশ্ন করতে থাকেন, 'পৃথিবীতে এসবই কি জীবনের অর্থ?'

লোকটির কথা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। তিনি যেন আমার মনের কথাগুলোকে পাঠ করেছেন। আমার নিজের জীবন সম্পর্কে আমি যা ভেবে আসছিলাম, প্রায় সেই শব্দগুলোই তিনি ব্যবহার করছেন। তিনি আরও বললেন, 'আমার বন্ধুরা, জীবনে অর্থ উপার্জন ও আনন্দে সময় কাটানোর চেয়ে আরও ভিন্ন কিছু আছে। জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে হলে আপনাকে আপনার নিজের মধ্যে দৃষ্টি দিতে হবে। নিজেকে প্রশ্ন করুন, আমি কেন জন্মগ্রহণ করেছি? এই পৃথিবীর অস্তিত্ব কেন? মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাব? নীরবে, একান্তে এই প্রশ্নগুলো ভাবুন, মনকে সকল ভাবনা থেকে মুক্ত করে এই প্রশ্নের ওপর ধ্যান করুন। দেখবেন সত্য আপনার মাঝেই। ঈশ্বরও আপনার মাঝে।' তাঁর কথাগুলো আমি বুঝতে না পারলেও আমাকে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করল। যাহোক, আড্ডা দেওয়া, মদ পান করা, গাঁজার কল্‌কেতে দম দেওয়া এবং বন্ধুদের সঙ্গে শয্যাগমনের মধ্যে আমি আর তেমন আনন্দ পাচ্ছিলাম না। আমার মধ্যে ইতোমধ্যে যে যন্ত্রণা ছিল তা আরও বৃদ্ধি পেল। আমি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিটি লেকচারে উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেখানে কিছু ভারতীয়ের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছিল। আমি তাদের দেশে ধ্যানমূলক কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে জানতে চাইতাম। তারা আমাকে আশ্রমের কথা বলতেন যেখানে মানুষ একত্রে বাস করে, প্রার্থনা ও ধ্যান করে সম্মিলিতভাবে। সেসব স্থানে মদপান, ধূমপান ও যৌনকর্ম নিষিদ্ধ। খাবার

পুরোপুরি নিরামিষ, কারণ পশুহত্যাকে বিবেচনা করা হয় পাপ হিসেবে। স্পার্টার সদৃশ সংঘবদ্ধ জীবনের ধারণা আমাকে কৌতূহলী করে তুলল। আমি একটা উদ্যোগ নিতে চাইলাম, অন্তত এক বা দুমাসের জন্য।

ভারতে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা রয়েছে, কিন্তু সেগুলো ধ্যানের চেয়ে বরং সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অধিক জড়িত। যেসব ভারতীয় আমার বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল তারা বিভিন্ন আশ্রমে যাওয়ার পরামর্শ দিলো—পণ্ডিচেরির অরবিন্দ আশ্রম, পুত্তাপারতি সাঁই বাবার আশ্রম, পুনার ওশো কমিউন, পাঞ্জাবে রাধা স্বামী এবং গঙ্গার তীর জুড়ে আরও বেশ কিছু জায়গা। আমি তাদের অনেককে লিখলাম এবং উত্তরে তাদের শর্তাবলিসহ মুদ্রিত বিবরণী পেলাম। আমেরিকার তুলনায় থাকার ব্যবস্থা অত্যন্ত সস্তা। দৈনিক পাঁচ ডলারের বেশি নয়। হরিদ্বারের কাছে গঙ্গার পশ্চিম তীর বরাবর হিমালয়ের কোলে বৈকুণ্ঠধামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এই জায়গাগুলো কোথায় অবস্থিত তা দেখার জন্যে আমি ভারতের মানচিত্রের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়েছি। 'বৈকুণ্ঠধাম', অর্থাৎ পৃথিবীর স্বর্গ, নামটি আমার খুব পছন্দ হলো। আমার কাছে পাঠানো ক্যাটালগের ছবিটিও আমার ভালো লাগল: চারপাশে বিশাল চত্বরসহ একটি মন্দির। চত্বর ঘিরে আশ্রমে বাসিন্দাদের জন্য কক্ষসহ টানা বারান্দা, একটি ধ্যানকক্ষ এবং দীর্ঘ একটি টেবিল ও কাঠের বেঞ্চসহ একটি ডাইনিং রুম।

আমার সবচেয়ে ভালো লাগল ক্যাটালগে লেখা 'অবস্থান ব্যয়'-এর জায়গাটি। এতে বলা হয়েছে, 'আপনার যত খুশি দিন অথবা যতটা আপনার সাধ্যের মধ্যে যা আছে ততটাই দিন।'

আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। আমার মাকে বললাম যে, দুমাসের ছুটিতে আমি ভারতে যাচ্ছি।

'যিশুর দোহাই, এত জায়গা থাকতে ভারতে কেন?' তিনি প্রশ্ন করলেন। 'ভিখারি এবং সব ধরনের রোগব্যাধি ও অদ্ভুত সব লোকে পরিপূর্ণ।'

'দেশটিতে এমন কিছু আছে, যা পৃথিবীর আর কোথাও তা নেই। আমি যদি তা না পাই তাহলে শিগ্‌গিরই ফিরে আসব', আমি উত্তর দিলাম।

আমি একটি ইংলিশ-হিন্দি ডিকশনারি কিনে চলাফেরার মতো কিছু হিন্দি শব্দ শিখে নিলাম। দেশটিতে পৌঁছার আগে সে-দেশের একটু স্বাদ নিতে আমি নিউইয়র্ক-লন্ডন-দিল্লি রুটের এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্টে আমি ইকোনোমি ক্লাসের কাউন্টারের সামনে ভারতীয়দের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ালাম। ডেস্কের একটি লোক এগিয়ে

এসে আমাকে লাইন থেকে আলাদা করে কাউন্টারে নিয়ে আমার ব্যাগ চেক করে বোর্ডিং পাস দিয়ে দিলো, 'ম্যাডাম, ইকোনোমি ক্লাস যাত্রীতে পরিপূর্ণ। আপনাকে আমরা বিজনেস ক্লাসে আপগ্রেড করে নিচ্ছি। আপনার ভ্রমণ আনন্দময় হোক।' বাদামি ও কালো লোকদের মাঝে শ্বেতাঙ্গ ও সোনালি চুলবিশিষ্ট হওয়ার মূল্য পেলাম।

হিথ্রো এয়ারপোর্টে জাঁকজমকপূর্ণ মহারাজা লাউঞ্জে নাশতা করে দোকানে দোকানে ঘুরলাম। দিল্লিগামী নতুন কিছু যাত্রী যোগ হয়েছে। তাদের কারো কারো সাথে কথা হচ্ছিল। আমি কেন ভারতে যাচ্ছি তা জানার ব্যাপারে তারা অত্যন্ত কৌতূহলী। যখন আমি বললাম যে, 'তেমন কোনো কারণে নয়, শুধু একা কাটাতে ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার জন্য ধ্যান করতে।' একথাটি গোটা বিমানে ছড়িয়ে পড়ল এবং আমি যাত্রীদের আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হলাম। যাত্রীদের একজন, যার বাড়ি দেরাদুনে, সে আমার কাছে চলে এলো কথা বলতে।

'আমি কখনো বৈকুণ্ঠধামে যাইনি, কিন্তু জায়গাটি সম্পর্কে অনেক শুনেছি। যেখানে আমি থাকি সেখান থেকে খুব দূরে নয়। আমি শুনেছি যে, গঙ্গার তীরে পর্বতের মধ্যে এটি সুন্দর এক আশ্রম। যে লোকটি আশ্রম পরিচালনা করেন, বলা হয় যে, উনি অত্যন্ত জ্ঞানী লোক। দৈনিক প্রার্থনা ও ধ্যান পরিচালনায় তিনি কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। আপনি কীভাবে ওখানে যাবেন?'

'ট্রেন! বাস বা গাড়িতে! আমার ধারণা নেই। হোটেলে কোনো ট্রাভেল এজেন্টের কাছে জেনে নেব। একটি হোটেলে তিন-চারদিন থাকার পরিকল্পনা করেছি,' আমি উত্তর দিলাম।

'আমি এখনই আপনাকে বলে দিতে পারি,' লোকটি বললেন। 'দিল্লি থেকে আপনি একটি ট্যাক্সি নেবেন। হরিদ্বারে পৌঁছতে আপনার পাঁচ ঘণ্টা লাগবে। এরপর গঙ্গার তীর বরাবর পর্বতের মধ্যদিয়ে একটি রাস্তা ধরে যেতে হবে আপনাকে। দুই ঘণ্টায় পৌঁছে যাবেন বৈকুণ্ঠধামে। দিল্লি থেকে সকালে রওয়ানা হলে বিকেলের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন। ট্যাক্সিতে দুহাজার রুপির বেশি লাগবে না।' দ্রুত ডলারে হিসাব করে নিলাম। আমার বাজেটের মধ্যেই আছে। আমি ইতোমধ্যে লা মেরিডিয়েন হোটেলে তিনদিন অবস্থান করার ব্যয় আমার ট্রাভেল এজেন্টকে পরিশোধ করেছি।

নয়াদিল্লির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন, কাস্টমস ও ট্যাক্সি ক্যাব সম্পর্কে নানা বাজে কথা শুনেছি। কিন্তু আমার কোনো সমস্যা হয়নি। এয়ার

ইন্ডিয়ার একজন অফিসার আমাকে ইমিগ্রেশনের লাইন অতিক্রম করিয়ে আমার ভিসার মোহর লাগিয়ে নিয়ে গ্রিন চ্যানেল দিয়ে আমার ব্যাগেজ পার করে আমাকে দেরাদুনের সহযাত্রীর জিম্মায় ছেড়ে দিলেন, যিনি আমাকে তার গাড়িতে লা মেরিডিয়েনে পৌঁছে দেবেন। অচেনা একটি দেশে এর চেয়ে ভালো বা উপভোগ্য অভ্যর্থনা আর কী হতে পারে। মাঝরাতের একটু পর আমরা অবতরণ করেছি, দুঘণ্টা পর দরজার ওপর 'ডোন্ট ডিসটার্ব' সাইন ঝুলিয়ে হোটেলের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুমে গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম।

কত দীর্ঘ সময় ধরে আমি ঘুমিয়েছি, জানি না। আমার ঘড়িতে তখনো নিউইয়র্কের সময়। যখন ঘুম ভাঙল তখন বাইরে দিনের উজ্জ্বল আলো। মনে হলো, আমি যে নিরাপদে পৌঁছেছি, সে খবরটা মাকে জানানো উচিত। হোটেলের অপারেটর কানেকশন দিলে আমার মাকে গজরাতে শুনলাম, 'কে, কে?'

'আমি ফোন করেছি মম, আমি এখন দিল্লিতে।'

'এটা ফোন করার কোনো সময়?' আবার গর্জে উঠলেন তিনি। 'যিশুর নামে বলছি, এখন রাত দুটা বাজে।'

'সরি, মম। এখানে মধ্য সকাল। ঠিক আছে তুমি ঘুমাও।' তিনি শব্দ করে ফোন রাখলেন। আমার অনুপস্থিতিতে তাকে কিছুমাত্র কাতর মনে হলো না। আমার হোটেল রুমটি আমেরিকার যেকোনো জায়গার কোনো ভালো হোটেল রুমের মতোই। বাথরুমে শ্যাম্পুর বেশ কিছু ছোট ছোট বোতল, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট টিউব এবং একটি শেভিং কিট। টয়লেটের আসনের ওপর কাগজের রিবন মোড়ানো। রুমের দেওয়ালে সুইস আল্পসের ছবি এবং বিছানার পাশে টেবিলের ওপর একটি বাইবেল। আমি যে ভারত দেখতে চাই, এটা সেই ভারত নয়। শাওয়ারের নিচে নিজেকে ভিজিয়ে নতুন জামাকাপড় পরে নাশতা বা লাঞ্চ করতে রুমের বাইরে এলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে কোনটা করতে হবে। রিসেপশনে গিয়ে আবিষ্কার করলাম যে দুপুর গড়িয়ে গেছে। অতএব, কফি শপে গিয়ে স্যুপ, স্যান্ডউইচ ও কফি নিলাম। এরপর শপিং আর্কেডে ঘুরাফিরা করতে লাগলাম: জুয়েলারি, কার্পেট, শাল, অ্যান্টিক, ড্রাগ স্টোর। লিফটে উঠে হোটেলের সর্বোচ্চ তলায় গেলাম, যেখানে একটি বড় বার ও রেস্টুরেন্ট। বিশাল জানালা দিয়ে আমি নগরীর দৃশ্য অবলোকন করলাম, যার মধ্যে প্যারিসের 'আর্ক ডি ট্রিওম্ফের' মতো একটি বিশাল ফটক দেখতে পেলাম, যেটি প্রশস্ত রাস্তা ও দুপাশে ফুলের গাছের সারি এবং সেক্রেটারিয়েট ও প্রেসিডেন্ট ভবনের মধ্যবর্তী স্থানে পানির আধার। গাইড বুকে ফটকটির নাম ইন্ডিয়া গেট এবং প্রেসিডেন্ট ভবন পরিচিত রাষ্ট্রপতিভবন

নামে। এটি আমাকে ওয়াশিংটনে ক্যাপিটল হিলের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। গাড়ি, বাস, ক্যাবের সারি এবং থ্রি হুইলার, যা আগে আমি কখনো দেখিনি—দুদিক থেকে চলছে। দিল্লি পরিচ্ছন্ন এবং সুশৃঙ্খল নগরী, যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে কোনো শব্দও শোনা যাচ্ছিল না। যে ভারতকে আমি কল্পনা করেছি এটি সেই ভারত নয়।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি বাসে একদল টুরিস্টের সঙ্গে আমি যখন নগর পরিভ্রমণে বের হলাম তখন প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ ধারণা পেলাম। অনেক প্রাচীন সৌধ অতিক্রম করে এবং ভিড় ও কোলাহলপূর্ণ বাজারের মধ্যদিয়ে গেলাম আমরা। আমি আগে কখনো কোথাও এত মানুষ দেখিনি। যেখানেই গেলাম শুধু মানুষ আর মানুষ। এটি আমার কল্পনার ভারতের মতোই।

আরও দুটি দিন কাটালাম দিল্লিতে পায়ে হেঁটে ঘোরাঘুরি করে। যেখানেই গেছি ভিখারিরা আমার পিছু নিয়েছে। বন্ধুরা যেভাবে পরামর্শ দিয়েছিল, সে অনুসারে আমি তাদেরকে কিছু দিতে অস্বীকার করলাম। ভিড়পূর্ণ ফুটপাত দিয়ে চলার সময় দুবার কেউ আমার নিতম্ব স্পর্শ করল। নিতম্ব স্পর্শকারী ও ব্যাগ ছিনতাইকারীদের ব্যাপারে আমাকে সতর্ক করা হয়েছিল। অতএব ব্যাগ আঁকড়ে ধরে থাকার কারণে আমি আমার নিতম্ব সামলাতে পারিনি। অবশ্য এ বিষয়টি আমাকে খুব বিচলিত করেনি। বরং মনে হলো যে, এর ফলে আমি প্রকৃত ভারতের ঘনিষ্ঠ হতে পারছি।

১৯৮০ সালের ১ মার্চ সকাল সাতটার দিকে আমি বৈকুণ্ঠধামের উদ্দেশ্যে দিল্লি ত্যাগ করলাম। আমার ড্রাইভার বহু রংবিশিষ্ট পাগড়িধারী তরুণ শিখ। সে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি বলতে পারে এবং একটু বেশি স্মার্ট প্রমাণ করতে চায় নিজেকে। অতএব যাত্রার শুরুতেই আমি তাকে তার জায়গায় রাখার জন্য বললাম, 'তোমার চোখ রাস্তার ওপর রাখো। আমি যদি কিছু জানতে চাই, তাহলে তোমাকে বলব। বেশি কথা বলতে পছন্দ করি না আমি।' 'জি, ম্যাডাম', সে উত্তর দিলো। 'আমরা হরিদ্বার যেতে মাঝপথে একবার থামব। আপনি সেখানে গরম কফি পান করতে পারেন। আমি অল্প সময় বিশ্রাম নেব।'

আমরা দিল্লি থেকে বের হয়ে অদ্ভুত, অগোছালো অনেক শহর পেরিয়ে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় যানবাহনের প্রচণ্ড ভিড়—কার, বাস, ট্রাক্টর, গরুর গাড়ি, সাইকেল—ড্রাইভার সারাক্ষণ হর্ন বাজিয়ে যাচ্ছিল। দুপাশে যেসব গ্রাম পড়ল সেসবের দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করেনি: স্থানে স্থানে গমের সবুজ ক্ষেত ও আম বাগানসহ সমতল চাপাতি রুটির মতো। এত ধূলিপূর্ণ জায়গায় আগে কখনো যাইনি। ট্যাক্সির জানালা তুলে দিয়েছি, এয়ারকন্ডিশনারও চালিয়ে দিতে

বলেছি যাতে ধূলি ও কোলাহল না আসে। যে শহরগুলো অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম সেগুলোর নাম জানার প্রয়োজন বোধ করলাম না। কারণ এসব নামের কোনো অর্থ থাকার কথা নয় আমার কাছে। আড়াই ঘণ্টা পর চিতা পয়েন্ট নামে এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করলাম যেখানে একটি ফাস্টফুডের দোকান আছে।

'ম্যাডাম, আমি নাশতা সেরে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব', ড্রাইভার আমাকে বলল।

আমি এসপ্রেসো কফি ও চিজবার্গারের অর্ডার দিলাম। যদিও এসপ্রেসো কফির চাইতে বরং ফেনাই বেশি এবং চিজবার্গার পুরোই নিরামিষ, তবুও আমি দুটোই উপভোগ করলাম। বিল পরিশোধ করে ফুল ও বড় বড় খাঁচায় রাখা হাঁস, টার্কি, টিয়া ও বিভিন্ন ধরনের পাঁতিহাস-সমৃদ্ধ সুন্দর বাগানে এক চক্কর ঘুরলাম। রেস্ট রুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে লনে একটি চেয়ারে বসলাম। জায়গাটি মনে হচ্ছে জনপ্রিয় বিরতিস্থল।

আধ ঘণ্টা পর আবার আমরা রাস্তায়। দূরে পাহাড়-পর্বত দৃশ্যমান হয়ে উঠায় দুপাশের গ্রামগুলো অসমতল হয়ে উঠছে। ক্রমেই ফসলিজমি কমে আসছে এবং বন বাড়ছে। একটু পরপরই দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল লাল ফুলে গাছ ছেয়ে আছে। আমি অনুমান করলাম যে, এটাই বনের শিখা। নিশ্চয়ই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম আমি। ড্রাইভার যখন ঘোষণা করল, 'ম্যাডাম, হরিদ্বারে পৌঁছে গেছি', তখন আমি জেগে উঠলাম। অতি পবিত্র শহর হরিদ্বার। 'হর কি পৌঁড়ি' গঙ্গামাতার কাছে যাওয়ার ধাপ, যেটি পৃথিবীর পবিত্রতম স্থান।

সরু, ভিড়পূর্ণ বাজারের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করার পর মাঝে মাঝে স্বল্প সময়ের জন্যে নদী পড়ল দৃষ্টিপথে। এরপর আমার বামদিকে পর্বতের প্রাচীর, নদীর পাশাপাশি প্রশস্ত উপত্যকা এবং গাছপালা পরিপূর্ণ পাহাড় নদীর অপর তীরে। আমরা আরও ওপরের দিকে উঠে গেলাম ধূলিময় রাস্তা দিয়ে অনেক মন্দির এবং ছাইমাখা ও গেরুয়া বস্ত্রধারী সাধুকে অতিক্রম করে। বিকেল তিনটার দিকে আমরা প্রধান রাস্তা ছেড়ে পর্বতের প্রান্ত ঘেঁষে ঘন বুনোপথে গঙ্গার প্রায় তীর ধরে একটি সমতল জায়গায় পৌঁছলাম, যেখানে সবজি ও নানা ঔষধি গাছ জন্মাচ্ছে। পাশেই সাদা রঙের একটি প্রাচীর ও ফটক।

'ম্যাডাম, বৈকুণ্ঠধাম,' ড্রাইভার বিজয়ীর মতো বলল এবং গাড়ি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল।

ছবিতে যেমন দেখা গেছে ঠিক তেমনই—মন্দির, চত্বর, কক্ষের সারি। পরিচিতিমূলক পুস্তিকায় যা নেই তা হলো বৈকুণ্ঠধামের চারপাশ ঘিরে মনোরম

মন্দির, গঙ্গামুখী রাস্তা, পাইন ও ফারের সুগন্ধি বয়ে নেওয়া বাতাস, পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে চলা নদীর শব্দ। আমি জানতাম যে জায়গাটিকে আমি ভালোবাসতে যাচ্ছি।

অতিরিক্ত একশো রুপি বখশিশসহ ড্রাইভারকে তার ভাড়া পরিশোধ করলাম, সে খুবই খুশি হলো। আরও খুশি হলো হরিদ্বার ও আরও দূরের যাত্রী পাওয়ায়। আমি রিসেপশন কাউন্টারে গেলাম।

কাউন্টারের লোকটি বলল, 'ইয়েস ম্যাডাম! আপনি নিশ্চয়ই নিউইয়র্কের লেডি মার্গারেট ব্লুম। আপনি নিজের জন্যে একটি রুম চান। দুমাসের জন্যে আপনার জন্যে একটি রুম রির্জাভ রাখা হয়েছে। সান্ধ্য প্রার্থনা শুরু হয় ছটায়। প্রার্থনা শেষে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়। আমার বিশ্বাস আপনার সাথে কোনো অ্যালকোহল বা সিগারেট নেই—এখানে এসব নিষিদ্ধ। আপনাকে আপনার রুমে নিয়ে যাচ্ছি। স্বামীজি কাল আপনাকে স্বাগত জানাবেন সকালের প্রার্থনার পর।

আমাকে আমার রুমে নেওয়া হলো। রুমে একটি চারপায়া, যার ওপর একটি মাদুর, একটি বালিশ; এছাড়া একটি চেয়ার, একটি টেবিল, একটি বাতি, একটি সিলিং ফ্যান, দেওয়ালে দুটি ছবি—একটি গলায় সাপ পেঁচানো ভগবান শিবের, আরেকটি গেরুয়া বস্ত্রধারী ন্যাড়া মাথাবিশিষ্ট একটি লোকের, মনে হলো, তিনিই স্বামীজি। রুমে কোনো আয়না নেই। পরে আমি শুনেছি যে, আয়না না থাকার কারণ হচ্ছে, স্বামীজি বিশ্বাস করেন যে, কেউ নিজের চেহারা দেখে আত্মপ্রশংসা করলে তার অহমিকা ও গরিমাকেই গুরুত্ব দেয় সে। এবং এ দুটিই পাপ হিসেবে বিবেচিত।

'কোনো টয়লেট নেই? আমি বলতে চাচ্ছি, কোনো বাথরুম নেই,' আমি প্রশ্ন করলাম।

'ম্যাডাম, ওগুলো বাইরে। ওই দরজা দিয়ে যেতে হবে।' লোকটি একটি দরজা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, যেটি আঙ্গিনার পশ্চিমদিকে দেওয়ালের সাথে।

'মহিলা ও পুরুষদের জন্যে পৃথক ব্যবস্থা। দুটি আছে ইউরোপীয় ধরনের। বাকিগুলো ভারতীয়। সাবান ও শ্যাম্পু ব্যবহার করতে চাইলে সেজন্য ওয়াশরুমও আছে। গঙ্গায় এগুলো ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না।

আমি রুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে চারপায়ার ওপর শুয়ে পড়লাম। এটা মোটেও আরামদায়ক কোনো বিছানা নয়। কিন্তু এটা কোনো ব্যাপার বলে মনে হলো না আমার কাছে। যদিও আমি ক্লান্ত, কিন্তু আমার ঘুম এলো না।